সমরেশ বসুর সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষ

ডঃ শিপ্রা মজুমদার

"মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করলেন। শুরু হল কঠোর সংগ্রামের জীবন। ঝাঁকা মাথায় করে ফেরি করা থেকে খোঁয়াড়ে আট-আনা রোজে চাকরী পর্যন্ত অবশেষে পাঁচসিকে রোজে ইছাপুর অর্ডিনেন্স ফ্যাকটরিতে ট্রেসারের কাজ (১৯৪৩-৪৯)। এই সময়ই সমরেশের সাহিত্য জীবনের সূচনা।" তিনি বাংলা সাহিত্যের বহু বিতর্কিত কথাসাহিত্যিকও বটে। তাঁর জন্ম ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর এবং মৃত্যু ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ। বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের কাছাকাছি রাজনগর গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি 'কালকূট' ও 'ভ্রমর' এই দুটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন; তিনি ছিলেন চিরচঞ্চল, চির পথিক তাই তিনি 'ভ্রমর।' আর এই নামের সঙ্গেই তার মিল বেশি ছিল এবং এপার বাংলা ও ওপার বাংলা দুই বাংলাতেই তার বাসস্থান ছিল। জীবনের প্রথম বারো বছর সমরেশ ঢাকায় কাটিয়েছেন; তারপর থেকে তাঁর ঠিকানা হয় উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটিতে। সেখানে বড়দা মন্মথনাথের বাড়িতেই বসবাস করতে শুরু করেন।

বড়দা মন্মথনাথ তাঁকে নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে ভর্তি করে দেন কিন্তু সেখান থেকে ক্লাস এইট পাশ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি এবং এখানেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার অবসান ঘটে। তারপর আবার সমরেশ বসু ঢাকায় চলে যান; সেখানে বাবা মোহিনীমোহন বসু তাকে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে কাজে যুক্ত করে দেন কিন্তু 'যাযাবর-স্বভাব' সমরেশের সেখানও মন টিকল না পুনরায় সমরেশ নৈহাটিতে ফিরে আসেন। সমরেশ ছবি আঁকা ও বাঁশি বাজাতেও ভালো বাসতেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি একটি আর্ট স্কুলে ভর্তি হল। এরই মধ্যে সমরেশ বসু গভীর রোগে আক্রান্ত হন। সতেরো বছরের মৃতপ্রায় সমরেশকে বাঁচিয়ে তোলেন গৌরী দেবী; তারপর তিনি এই গৌরী দেবীকেই বিয়ে করেন।

আঠার-উনিশ বছরের সমরেশের জীবন সংগ্রামের শুরু আতপুরের বস্তিতে। কলকাতার অদূরবর্তী শিল্পাঞ্চল জুড়ে যে কুলিমজুর শ্রেণীর বাস তারাই হয়ে ওঠে তার আপনার জন। কারখানার জীবনের সঙ্গেই গড়ে ওঠে তাঁর আঁতের সম্পর্ক। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে সমরেশ ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরীতে 'Small Arms' এর Drawing বিভাগে পাঁচসিকে মজুরীতে কাজে যোগ দেন। ফলে কারখানার শ্রমিক শ্রেণীর জীবন তার চোখের সামনে দেখা; আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। সমরেশ বসুর অসংখ্য উপন্যাস ও ছোট গল্পে তাই বারবার 'শ্রমজীবী মানুষের কথা ফুটে ওঠে। কারখানায় কাজ করতে করতে তিনি লেখার রসদ পান; ফলে তাঁর সেই লেখার বিষয় শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে এগোবে তাতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে! কারখানার একজন শ্রমিকের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয় তাদের জীবনের ক্ষুধা, বঞ্চনা, তিক্ততার ইতিবৃত্ত কি রকম হয় তা লেখকের কলমের ছোঁয়ায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে

উঠে। আবার এরই পাশাপাশি লেখক তুলে ধরতে ভোলেন না শ্রমজীবী যুবক-যুবতীর প্রণয় রোমাঞ্চের কথা। ফলে তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে অনন্য মহিমায় ভরপুর।

সমরেশ বসুর অসংখ্য লেখাতে শ্রমজীবী মানুষেরা কথা এসেছে। শ্রমকে জীবিকা করে যারা জীবন অতিবাহিত করে তাদেরই বলা হয় শ্রমজীবী। শ্রম দু'ধরনের—কায়িক শ্রম এবং বৌদ্ধিক শ্রম। মূলতঃ এক্ষেত্রে শ্রম বলতে আমরা কায়িক শ্রমকেই বুঝে থাকি; বৌদ্ধিক শ্রমের এখানে বিশেষ কোনো জায়গা নেই। অবশ্য কলকারখানাতে যে কাজ করে সেই-ই শুধু শ্রমিক নয়; যে কোনো প্রকার কায়িক শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে যে সংসার চালায় সেও শ্রমজীবী মানুষের তালিকাতে পড়ে। সমরেশ বসুর সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক শ্রমকে বিশেষ করে ধরছিল। ফলে সমরেশ সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে কায়িক বা দৈহিক শ্রমের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে; সেই সূত্র ধরেই বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প এসে যায় সেখানে শ্রমজীবী মানুষের কথা তিনি বলেছেন। এছাড়া সমরেশ বসু প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন; পরে অবশ্য পার্টির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর মন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মনের খবর নিতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাই তাঁর অসংখ্য লেখাতে উঠে এসেছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ছবি।

১৯৪৬-৪৯ এই সময়টি লেখকের জীবনে গভীর সংকটের কাল হিসেবে চিহ্নিত। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারই মধ্যে চালাচ্ছেন তাঁর ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চা। লেখক স্বয়ং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ নিজের চোখে দেখেছেন; সেখান থেকেও তিনি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। একে একে লিখে চলেছেন তিনি অসংখ্য গল্প-উপন্যাস। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের মূল উপরকরণ মানুষ; বিশেষ করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ; যারা দৈহিক শ্রমকে সম্বল করে এগিয়ে চলে জীবনের পথে। তাঁর লেখা সেই কিছু গল্প-উপন্যাসকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর লেখায় শ্রমজীবী মানুষের উত্থানকে দেখতে চেষ্টা করব। আদাব, জলসা, প্রতিরোধ, শানা বাউরির কথা, কিমলিস, মন মেরামতের আশায় প্রভৃতি গল্পে ও অন্যদিকে মহাকালের রথের ঘোড়া, গঙ্গা, বি.টি. রোডের ধারে প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কথা।

আদাব ঃ আদাব সমরেশ বসুর প্রথম গল্প। এখানে তিনি অবলীলায় সর্বহারা শ্রমিকদের কথা বলেছেন। ১৯৪৬ সালে এটি রচিত ও ওই বছরই শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পে রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে হিন্দু সুতাকলের মজুর ও মুসলিম মাঝির এক করুণ মানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটেও লেখক মানব মনের কোমল সু মনকে তুলে ধরতে ভুলে যাননি। 'আদাব'-এর মূল পটভূমি ১৯৪৬ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। আর এই দাঙ্গার মূল কারণ 'মুসলিম লিগের' প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ এই দুটি দল নিজেদের শক্তি পরীক্ষার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং তারই ফলে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।

হিন্দু-মুসলমান এই দাঙ্গার ছোঁয়া কোলকাতাকেও স্পর্শ করে। নানা বৃত্তির তাগিদে যারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কোলকাতায় এসেছিল তারা নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

নোয়াখালি থেকে মুসলিমদের একটি বড় অংশ বন্দর শ্রমিকের কাজ করছিল; আবার বিহার থেকে হিন্দুদের একটি বড় অংশ কোলকাতায় কাজ করছিল। কিন্তু দাঙ্গার ফলে তাদের সকলেই নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ এই দাঙ্গার ফলে অনেক হিন্দু-মুসলিম শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। দাঙ্গার তীব্রতায় মুসলিমরা নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর এক তরফা আক্রমণ চালায়; অপরদিকে বিহারে হিন্দুরাও মুসলিমদের উপর এক তরফা আক্রমণ চালায়। এই বিভৎস্য দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে গঙ্গার এপারের এক হিন্দু সুতামজুর ও গঙ্গার ওপারের এক মুসলিম মাঝির ভয়মিশ্রিত করুণ মানবিক সাক্ষাৎকারের কাহিনী 'আদাব' গল্পে উঠে এসেছে। 'আদাব' শব্দের মূল অর্থ প্রণাম, নমস্কার বা সম্মান প্রদর্শন। একে অপরের প্রতি সম্ভ্রমসূচক আচরণই আদাব।

'দাঙ্গা' বিধ্বস্ত অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও কারফউ জারী হয়েছে; বিরাট পুলিশ বাহিনী টহল দিচ্ছে-চারিদিকে মৃত্যুর হাতছানি। এই রকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় একটি লোক একটি বড় ডাস্টবিন-এর আড়ালে পড়ে থাকতে থাকতে দেখতে পায় যে হঠাৎ যেন ডাস্টবিনটা একটু নড়ে ওঠে। আস্তে করে ডাস্টবিনটা নাড়া দিতেই দেখা যায় তার মধ্যে থেকে শীর্ণ একটি মানুষ বেরিয়ে আসে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না; কেউ কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না; এমনকি একজন অন্য জনকে শত্রু ভাবতে থাকে। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও কেউ কাউকে আঘাত করে না এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে যেন বিশ্বাস ফিরে আসে। তারপর একে অপরের কাছে নিজের পরিচয় দেয়। সুতাকলের মজুর জানায় তার বাড়ি নারায়ণ গঞ্জের চাষাপাড়ায় আর মাঝি জানায় তার বাড়ি বুড়ি গঙ্গায় ওপারে। পরিচয়ের প্রথমেও একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং পরস্পর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও হিন্দু মুসলমানের চেঁচামেচিতে উভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবে। মাজি সেখান থেকে চলে যাবার কথা বললে সুতামজুর বলে—"ভালো কথা কইছি ভাই; বইসো, মানুষের মন বোঝ না?" এখনও পর্যন্ত তারা কেউ জানেনা যে তারা স্বজাতীর কিনা। চিৎকার চেঁচামেচি কিছুটা মিলিয়ে থেকেই সুতামজুর পকেট থেকে বিড়ি বার করে মাসিকে দেয়; বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে মাঝি সুতামজুরকে বলে—"হ্যাঁ সে মুসলমান; মাঝির বগলের একটি ছোট্ট পুঁটুলিতে কিছু জামাকাপড় বাধা ছিল যা সে ইদউপলক্ষ্যে তার বাচ্ছা বেট-এর জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হিন্দু সুতামজুর সন্দেহ ভরা চোখে তার পুঁটুলির দিকে তাকাতেই মাঝি সরল বিশ্বাসে সেটি তার দিকে এগিয়ে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে মানবিক বিশ্বাস কিছুটা হলেও যেন ফিরে এসেছে। তারপর আরো কাছাকাছি এসে তারা আত্মীয় বন্ধুর মত গল্পগুজব করতে থাকে।

হঠাৎ একদল সেনার পায়ের আওয়াজে তারা গল্প থামিয়ে দেয়; প্রচন্ড ভয়ে তারা ছুটে পাটুয়াটুলি রোডের কাছে মেথর গলির কাছে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তারা দাঁড়িয়ে হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। হিন্দু সুতামজুরকে মাঝি পরের দিন সকালে বাড়ি যেতে বলে এবং মাঝি বাদামতুলির ঘাটে পৌঁছে সাঁতার সাঁতার দিয়ে বুড়ি গঙ্গা পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছবে। এইভাবে দুজনে দু'জনকে আদাব জানিয়ে বিদায় নেয়; কিন্তু মাঝির আর বাড়িতে

পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। রাস্তায় পুলিশের গুলিতে মাঝির দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বিদায় বেলায় মাঝি সুতামজুরকে বলেছিল "যাই ভুলুম না ভাই এই রাতের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার সাথে মোলাকাত হইব।" এই আবেগঘন মুর্হূত তৈরী করতেও লেখক ভোলেননি। এই দারুণ মানুষের জীবনকে যেমন কেড়ে নিয়েছে তেমনি কেড়ে নিয়েছে মানুষের জীবিকাকে। এতদিন পর্যন্ত মাঝির নৌকায় জমিদার রূপবাবুর নায়েব মশাই কাছারি সেত এবং তার বিনিময়ে তাকে দশ টাকা দিত; যাতে তার সারামাস চলে যেত। এইভাবে দেখা যায় কায়িক শ্রমের বিনিময়ে যারা সংসার চালাত তাদের আর বেঁচে থাকার কোন রাস্তা থাকে না; বেঁচে থেকেও তারা যেন মৃতপ্রায়। ফলে 'আদাব' গল্পে শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথায় লেখক তুলে ধরেছেন।

কিমলিস ঃ কিমলিস সমরেশ বসুর এক অনবদ্য গল্প। এখানে তিনি বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জীবনের ছবিকেই তুলে ধরেছেন। 'কিমলিস' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেচন। দীর্ঘদিন জেলখানার জীবন কাটিয়ে সে তার বস্তির জীবন থেকে যেন আলাদা হয়ে গিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে আসার পর তার বা-মা থেকে শুরু করে বস্তির কেউই যেন তাকে মানিয়ে নিতে পারছিল; এমন কি তার স্ত্রী ঝুনিয়াও তাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। জেলের জীবন অন্তত বস্তির জীবনের থেকে উন্নত ছিল। বেচন সেখানে স্নো-পাউডার, সুগন্ধ ব্যবহার করত এবং জেল থেকে ফেরার সময় সে তার বউ-এর জন্যও কিছু সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে এসেছিল। দেড় বছর আগে কারখানায় রেশনিং ব্যবস্থার গোলমালের কারণে শ্রমিকদের হরতাল ডাকার কারণে বেচনকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেল থেকে ফিরে আসার পর বেচনের চাকরী না থাকায় তার অবস্থা বস্তিবাসীদের চেয়েও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বেচন আসলে ছাটাই শ্রমিকদের প্রতিবাদী হতে সাহায্য করছিল; ফলে তার কোনো কাজ ছিল না; দু'একটা চাকরী পেলেও তা টিকছিল না; কারণ সে মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলে। এর মধ্যে কারখানার কিছু শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের নোটিশ আসে; তার মধ্যে বেচনের মা রামদেই এর নাম ও ছিল। বেনে কারখানার গেটের সামনে অন্য নেতাদের সঙ্গে বেচন ও প্রতিবাদী বক্তৃতা দেয়, শ্রমিকদের রুখে দাঁড়াতে বলে; এবং প্রতিবাদী বক্তৃতায় সমস্ত শ্রমিক জোটবদ্ধ হয়ে ওঠে মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়বার জন্য। ঠিক এই সময় বেচনের উপর তীব্র আঘাত আসে; সে বেঁহুশ হয়ে পড়ে যায়। তারপর বেচনের বাবা বনোয়ারী ও কিছু কারখানার শ্রমিক কাজ বন্ধ করে তাদের সঙ্গে আসে। এরপর সকলের বেচনের তীব্র প্রতিবাদী সত্তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ দেখা যায় 'কিমলিস' গল্পেও লেখক শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র কে সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

মন মেরামতের আশায় ঃ এই রচনাটি ১৩৮৩ সালের নববর্ষ সংখ্যা 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও এটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি। এই রচনাটিতে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্তের একটি গ্রামের কথা; এখানে অবশ্য কোনো কারখানার কাজ করা শ্রমিকের জীবন অংকিত হয়নি। তবে এখানেও অন্য এক ধরনের শ্রমের কথা উঠে এসেছে। একদা সেই গ্রাম জীবনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, সেখানকার মানুষদের নতুন নেশার ব্যবসা, নতুন সমস্যা এই রচনায় উঠে এসেছে। এই রচনার বন্ধুর ম্লান মৃত্তিকা, রুক্ষ পরিবেশ লেখকের পরিনতি

অভিজ্ঞতার যোগান দিয়েছে। 'মন মেরামতের আশায়' লেখকের অত্যন্ত বস্তুধর্মী লেখা। মন এখানে হালকা হবার অবকাশ ও পায় না। এখানে 'চোলাই মদের ব্যবসা' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে; যেখানে যুক্ত থাকে অসংখ্য স্ত্রী ও পুরুষ মানুষ; এই ব্যবসাতেও জীবন মরণপন করে শ্রম নিয়োগ করতে হয়। 'চোলাই মদের' ব্যবসা করেও অনেক মানুষ দিন গুজরান করেন। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে 'সানুদি' সে চোলাই মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কোমরে সাপরে মত সাইকেলের টিউব জড়িয়ে পুলিস ইন্সপেক্টারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সানুদি চোলাই বিক্রি করে। এইভাবে শ্রম দিয়ে সে টাকা পয়সা আসে তা দিয়েই সানুদি তার নিজের এবং তার বাবার সংসারও কিছুটা পরিমাণে চালিয়ে থাকে। এই ভাবে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সামুদি জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এই রচনাতে লেখকের কলমে উঠে এসেছে শ্রমজীবী মানুষের ছবি।

গঙ্গাঃ সমরেশ বসুর বিশিষ্ট উপন্যাস গঙ্গা। এই উপন্যাসের মধ্যেও লেখকে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন। এখানে উঠে এসেছে গঙ্গাবক্ষে মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ছবি। মৎস্যজীবী মানুষদের প্রেম-প্রণয়, রোমাঞ্চ, বিশ্বাস, আচার, রীতি, প্রথা সবই লেখকের কলমের ছোঁয়ায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে 'গল্পতে'। নদীতে জাল ফেলে দৈহিক শ্রমের মধ্য দিয়ে এরা সম্বৎসরের রুজি জোগাড় করে। ফলে এরাও শ্রমিক। নিয়তি নির্দিষ্ট কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিভাবে ভয়ঙ্কর বিপদকে উপেক্ষা করে এই জেলে সম্প্রদায় বেঁচে থাকে তারই বিশ্বাস্য ইতিবৃত্ত সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'। শুধু জীবনযাত্রা নয় তাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা, আবেগ, তাদের চাওয়া-পাওয়া সবই এখানে চিত্রিত। লেখক এখানে জেলেদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন। ফলে নৌকাচালনা সংক্রান্ত পরিভাষা, নানারকম টেউয়ের স্বরূপ ও সংজ্ঞা যা ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না তা তিনি যথার্থ ভাবে তুলে এনেছেন এই উপন্যাসে। নদীর বুকের মতো জেলে মাঝিদের মনেও নানা রহস্যের ঝিকিমিকি থাকে বা লেখকের হাতের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নদীর ঢেউয়ের মতো জেলেদের চরিত্রে একটি সরল ও একটানা গতি, নীতি নির্ভরতা ও একটি উদার জীবনবোধ লক্ষ্য করা যায়। তাদের ফেলে আসা পুত্র-পরিবার পরিজন, আপন ঘরের মমতা বন্ধন সব আকাশের এক কোণে পড়ে থাকা ধোঁয়াটে মেঘের মত তাদের মনে করুণ স্মৃতি হয়ে মিলে থাকে; আর তার মধ্য দিয়ে চলে তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই।

নিবারণ সাঁহদা 'গঙ্গা' উপন্যাসের প্রধান কর্তা ব্যক্তি। সে ছিল বড় মাঝি; মসুদ্রের রহস্য সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞ। গহীন জলের লুকোনো বিপদ সংকেত তার জানা এবং সে এগিয়ে চলে এক গভীর জীবনদর্শন নিয়ে। নাবিক জীবন সম্পর্কে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। সে কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানত; যা মাঝি সমাজে প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিবারণ সাঁহদার এই মন্ত্রতন্ত্র জ্ঞান, সমুদ্র অভিজ্ঞতা, সমুদ্রের গতিবিধি সম্পর্কে তার জ্ঞান সবই মাঝি সমাজে তাকে এক বিশেষ স্থান দান করেছিল। তাঁর ভক্ত শিষ্য পাঁচু যে পরে মাঝি সমাজের পরবর্তী প্রধান ব্যক্তি হয়; তার মনে এসব অমৃত সম্পদের মত সংরক্ষিত ছিল।

নিবারণের পর পাঁচু জালবাহী মাঝিদের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়। তবে পাঁচুর ব্যক্তিত্ব, মনোবল, দুঃসাহস নিবারণের মত অত প্রখর ছিল না। গঙ্গার কয়েকটি শাখা নদীর নির্দিষ্ট

কক্ষপথই ছিল তার গমনাগমনের সীমা। তার বাইরে সে কিছু ভাবতে পারে না। বাংলার অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জেলে মাঝিরা শুধু মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে না নৌকা চালানোর মধ্য দিয়ে এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রী শক্তির আকর্ষণও অনুভব করে। পাঁচু কঠোর কর্তব্য পরায়ণ। তার এক চোখ নিবদ্ধ থাকে ভাইপো বিলাসের প্রতি; আর এক চোখ থাকে মাছ ধরে জীবিকা চালানোর প্রতি।

বিলাস একটু অন্য প্রকৃতির; তার জেলে মাঝিদের জীবনচর্চা, জীবনচর্যা, রীতিনীতি প্রথা সবকিছুর প্রতি মৌখিক আনুগত্য থাকলেও একান্ত নিষ্ঠা ছিল না। বিলাসের টলটলে যৌবন ছেলের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রেম পিপাসার সুতীব্র আকাংখা তাকে ঠেলে নিয়ে যায় হিমির দিকে। হিমি বিলাসের মিষ্টি মধুর প্রেমের ছবি উঠে এসেছে গঙ্গা উপন্যাসে। কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যেও প্রেম যে অমর তার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। নিম্ন শ্রেণীর দৃঢ় চরিত্র ব্যক্তির মনের প্রেমের আবেগ সহকারের বাধা পেরিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তারও চিত্র লেখক এঁকেছেন। দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে যে জেলে মাঝিরা জীবন চালায়; সেই মাঝিদের জীবনের জীবন্ত ছবিই লেখকের কলমে উঠে এসেছে।

মহাকালের রথের ঘোড়াঃ-'মহাকালের রথের ঘোড়া' সমরেশ বসুর লেখা এক অনবদ্য উপন্যাস। নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক আদিবাসী নেতার রাজনীতি ও জীবনকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। রুহিতন কুরমি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক এবং এই উপন্যাসে সেই নায়ক। তাঁর বিপ্লবের স্বপ্ন, আন্দোলন ও ব্যর্থতার কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়ক রুহিতন কুরমির সঙ্গী ছিল শ্রমিক নেতা ভাদুয়া মুন্ডা, কৃষক নেতা দিবা বাগচী, খেলু চৌধুরী প্রমুখরা। তরাইয়ের পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিত্ব রুহিতন কুরমি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তরাই চা বাগানের শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। রুহিতন কুরমির নেতৃত্বে চা বাগানের শ্রমিকরা কোলকাতায় এসে এক সভায় যোগ দিয়েছিল নিজেদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে জানতে। কিন্তু সভা ভাঙতেই দেখা যয় কেউ তাদের খোঁজখবর নেয় না, ফলে রুহিতন কুরমি দুঃখে ভেঙে পড়ে। রুহিতন কুরমি বিপ্লবী মানুষ; বিপ্লবই তার জীবনের ব্রত, শ্রমিক শ্রেণীর হয়ে সব সময় লড়াই করে গেছে। জীবনের শেষপর্বে সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় তখন সকলেই তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আত্মীয়-পরিজন, সংগঠন কেউই তার পাশে থাকেনি। শেষ পর্যন্ত মনের বিকারে রুহিতার কুরমি মাটিতে পুঁতে রাখা তার পুরানো রাইফেলটি বার করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে তার ট্রিগারে চাপ দেয়। কিন্তু সে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখতে পায় যে বন্দুক টোটা পূর্বের অবস্থায় নেই। তার দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে, শক্তিহীন তার দেহ। তবু একটাই তার সান্ত্বনা অপমান আর অভিশাপের আশ্রয় থেকে সে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে আসতে পেরেছে। এখন সে বুঝতে পারছে তার 'ঘুম' আসছে; এই 'ঘুম' সম্ভবতঃ মৃত্যুর ইঙ্গিতকেই বয়ে আগে।

আসলে 'মহাকালের রথের ঘোড়া'তে পার্বত্য তরাই অঞ্চলের চা-বাগানের শ্রমিক ও-ভূমিহীন কৃষকদের জীবনচিত্র বিধস্ত ভাবে উঠে এসেছে। ভূমিহীন কৃষকদের জীবনচিত্রণের মধ্য দিয়ে লেখক শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বাস্তব ছবিকেই রূপ দিয়েছেন। নায়ক রুহিতন কুরমির মধ্যে ব্যক্তি বিচ্ছন্নতা, মূল্যবোধে বিশ্বাসহীনতার ছবিও লেখক তুলে ধরেছেন। রুহিতন

কুরমির মধ্য দিয়ে লেখক একটি বিশেষ শ্রমজীবী শ্রেণীর চিত্রকে পাঠকের সামনে এনেছেন। পার্বত্য-তরাই অঞ্চলে মানুষ চা বাগানের শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়ে সংসার চালায়; এখানে সাধারণত ঃ সেই চিত্রটি সমরেশ বসুর কলমে উঠে এসেছে।

ফলে দেখা যায় সমরেশ সাহিত্যের মূল বিষয় মানুষ; মানুষ হিসেবে মানবতার দাবি নিয়ে লেখক মানুষের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। ভ্রমণবিলাসী যাযাবর সমরেশের অসংখ্য লেখাতেই উঠে এসেছে শ্রমজীবী মানুষের কথা। সেই শ্রমজীবী মানুষেরা শুধু যে কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে তা নয়; দৈহিক শ্রম নির্ভর বিভিন্ন পেশার সঙ্গে তারা যুক্ত থেকেছে। তাছাড়া প্রথম জীবনে সমরেশ বসু নিজেও কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করেছে, ফলে কারখানার জীবনের সঙ্গে ছিল তার 'আঁতের সম্পর্ক'। তাঁর লেখায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন যুদ্ধের কথায় শুধু উঠে আসেনি; উঠে এসেছে তাদের চাওয়া, পাওয়া, ব্যাথা বেদনা, প্রেম-প্রীতির কথা। সমরেশ সাহিত্যে তাই দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২. বাংলা ছোট গল্প— শিশির কুমার দাশ
৩. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (২খন্ড) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৪. বাংলা সাহিত্য পরিচয়—ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
৫. বহতা সময়ের গল্পচর্চা—সম্পাদনা মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬. সমরেশ বসু-আদাব থেকে মানুষ—আলোক রায়
৭. কালকূট রচনাসমগ্র (তৃয় খন্ড)—সমরেশ বসু
৮. সমরেশ বসুর বাছাই গল্প—সমরেশ বসু
৯. গঙ্গা—সমরেশ বসু
১০. মহাকালের রথের ঘোড়া—সমরেশ বসু
১১. সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার—নিতাই বসু
১২. সমরেশ বসু স্মরণ সমীক্ষণ—সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য